অর্থই অনর্থের মূল
যুথিকা বড়ুয়া

অর্থের নেশা, বড় ভয়ঙ্কর নেশা! যার নেশায় মানুষকে এমন এক গন্তব্যে টেনে নিয়ে যায়, যেখান থেকে ফিরে আসার পথ আর খুঁজেই পাওয়া যায় না! যখন অর্থের নেশায় উন্মত্ত মানুষ ক্রমে ক্রমে ভুলে যেতে থাকে নিজের ঐতিহ্য, সামাজিক, পারিবারিক রীতি-নীতি, ন্যায়-অন্যায়, এমনকী নিজের পরিবার পরিবর্গকেও! যখন আবেগ-অনুভূতি শক্তি হারিয়ে গিয়ে হৃদয়পটভূমি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়, ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসা।

সুদীপ্ত এমনিই এক ধনী বড়লোক বাপের একমাত্র সন্তান! যার জগৎ ছিল, তাশের আড্ডা থেকে নাইট ক্লাব! যেখানে মাদকদ্রব্য পান করে উর্বশী রমনীদের নিয়ে ব্যভিচারী পুরুষ মানুষেরা মৌজ -মস্তিতে ডুবে থাকে। কিন্তু কেন? মানুষ সেখানে যায় কিসের জন্য? তার বেশীর ভাগ কারণ, মানসিক সুখ-শান্তির অভাব! আর কারো বংশগত স্বভাব! তদ্রুপ সুদীপ্তও ওর মা-বাবার অগুপ্তি বিচ্ছিন্ন জীবনের শূন্যতায় মমতাহীন প্রাণহীণ সংসারে পরগাছার মতো থাকতে থাকতে একদিন অতিষ্ট হয়ে গিয়ে ডেরা পেতেছিল আতরের গন্ধভরা রাতের রঙ্গমহলে!
কিন্তু এর জন্য কে দায়ী? অবশ্যই মা-বাবা! কারণ, ছোটবেলা থেকেই সুদীপ্ত দেখে এসেছে, ওর মা-বাবা দুজনেরই মন-মঞ্জিল ছিল দুইপ্রান্তে! অথচ তাদের উদ্দেশ্য একটাই! প্রচুর অর্থ-ঐশ্বর্য্য, প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল এবং পূর্ণ মান-মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনযাপন করা!

যৌবনের প্রাক্কালে উচ্চাভিলাষী সুদীপ্তর মা অলকানন্দা ছিল একজন পেশাধারী অভিনেত্রী। রঙ্গ মঞ্চে অভিনয় করতো। পরে বৈবাহিক জীবনের শুরুতেই একটা বেসরকারী চাকুরিতে লিপ্ত হয়ে তার সংসারে দেখা দেয় অভাবনীয় বিশৃঙ্খলা! যেখানে ন্যায়-নীতি এবং গন্য মান্যের কেউ ধার ধারতো না! কখন কোথায় কেন এত দেরী, কেউই তার জবাবদিহী বা কৈফেয়ৎ দেওয়া নেওয়া প্রয়োজনই মনে করতো না! মূলতঃ মনুষ্য জীবনের চিরাচরিত পারিবারিক সাধারণ নিয়মাবলিই কখনো অনুসরণ করতো না! উপরন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক অবস্থান এবং বৈষয়িক উন্নতির অহমিকায় শুরু হয় দুজনার প্রতিদ্বন্দ্বীতা! যোগ্যতার মান নির্ণয় করা! ফলে উভয়েই উভয়ের সান্নিধ্যে নির্লিপ্ততার কারণে অচীরেই বিচ্ছিন্ন হয় দু'টি আত্মার একতা, ঘনিষ্ঠতা, হৃদ্যতা, পরম আত্মীয়তা! ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায় দূরত্ব! যখন স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে দাম্পত্য জীবন

এবং ভালোবাসার মূল্যবোধের শিকড় হৃদয়ের অনন্ত গভীরে বিস্তৃত হয়ে না পৌঁছাতেই ছিঁড়ে গিয়েছিল!

কথায় বলে, 'স্ত্রীলোক গৃহের অলংকার! গৃহস্থের শ্রী বৃদ্ধি করে! শোভা বাড়ায়!' অথচ ঘর-সংসার করার মতো কোনো ফরমূলাই জানা ছিলনা অলকানন্দার! বাস করতো ধরমশালার মতো! সারা দিনে স্বামী-স্ত্রীর মুখই দর্শণ হতোনা! হতো রাতের গভীরে! যখন পৃথিবীটাই নীরব নিস্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো! যার ফলে মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসা থেকে শুধু বঞ্চিতই নয়, তাদের সংস্পর্শ থেকেও একেবারে ছিটকে গিয়েছিল নাবালক সুদীপ্ত! যাকে পূর্ণ মাতৃত্ব দিয়ে দেখভাল করতো ওদের গৃহপরিচারিকা ললিতা! যাকে গোছায় গোছায় টাকা দিয়ে অলকানন্দা চেয়েছিল মাতৃস্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার অভাব পূরণ করতে। চেয়েছিল তার একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং বংশের প্রতীক সুদীপ্তকে সুশিক্ষায় মনের মতো করে গড়ে তুলতে। কিন্তু পারেনি! পারেনি স্নেহের বন্ধনে ওকে আলগে রাখতে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠলেও অসঙ্গতির কারণে খিটখিটে বদমেজাজ কর্মবিমুখ হয়ে বাঁধন হারা সুদীপ্ত ভবঘুরের মতো পড়ে থাকতো কুখ্যাত পল্লীর আড্ডাখানায়!

মানুষ পরিবর্তনশীল! সময়ের ধাপে ধাপে পৃথিবীর রং-রূপ যেমন বদলে যায়, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের বহু টানাপোড়োনের পর অবলীলায় বাহ্যিক মোহজাল ছিন্ন করে একদিন অলকানন্দাও পূর্ণ ঘরনী ও কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রী এবং স্নেহময়ী মা হয়ে ফিরে এসেছিল তার নিজের সংসারে কিন্তু শনির গ্রহ তার পিছুই ছাড়েনি তখনও!

মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যবোধের সংকীর্ণতায় সুদীপ্তর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়, অসংযমী বিদ্বেষপরায়ণ এবং বেপরোয়া মনোভাব! কিছুতেই পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতো না! নিজের গর্ভধারিনী মা অলকানন্দাকে কখনো মা বলে স্বীকার করতো না! কথায় কথায় ওর গোঁড়ামী, বিরোধীতা, মতানৈক্য, চিৎকার, চেঁচামিচি! বলতো,-'কে সুদ্বীপ! ও' হয় কে তোমাদের! ওর সঙ্গে কিসের সম্পর্ক! কি করেছ তোমরা ওর জন্যে! কখনো বুকভরে দিতে পেরেছ কিছু! না কখনো দেবার চেষ্টা করেছিলে! সুদীপ্ত নেই, মরে গেছে! ও' চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে তোমাদের জীবন থেকে!'

অথচ উত্তরাধিকারী সূত্রে বিপুল সম্পত্তির মালিকানা হাতে পেয়েই সুদীপ্ত সব ভুলে গেল! ভুলে গেল ওর অতীত! যখন শুরু হয় ওর রাজত্ব, তখন আর পায় কে! দিবারাত্রি নেশাদ্রব্য পান করে কু-পথে পয়সা উড়াতো! কেউ ছিল না বাঁধা দেবার! প্রতিবাদ করবার! মাকে তো গ্রাহ্যই করতো না! আর বাবাও ক্ষোভে, দুঃখে, মনঃস্তাপে পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকতো নীরব নির্জন

ক্ষীণ আলো অন্ধকার ঘরের কোণে! যাকে মিষ্টার রায় বলে সম্বোধন করতো সুদীপ্ত। কিন্তু পুরুষ মানুষ বলে কথা! সুন্দরী রূপসী তরুণী মহিলার সান্নিধ্যে যাবে না, তা কি হয় কখনো!

ক্ষণিকের হৃদয়াকর্ষক লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্যে মোহিত সুদীপ্ত, ধীর-স্থির-সুশীলা কন্যা জয়তীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলো ঠিকই কিন্তু পারে নি জয়তীকে হৃদয়ে ঠাঁই দিতে! ভালোবাসার জন্ম দিতে! পারে নি স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় সম্পর্কের মধুরতা গড়ে তুলতে! হৃদ্যতা স্থাপন করতে! পারে নি স্বামীর নৈতিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে! স্ত্রীর পূর্ণ আধিপত্য জয়তীকে সঁপে দিতে!
কিন্তু কতদিন! মানুষের মনবল, ইচ্ছাশক্তি চিরকাল থাকেনা! মস্তিস্কের স্নায়ূকোষগুলিও একদিন বিকল হয়ে পড়ে! ঢিলে হয়ে আসে শরীরের চামড়ার মতো! যখন যৌবনকাল পেরিয়ে মানুষ বার্দ্ধক্যে এসে পোঁছায়! আর তখনি প্রয়োজন হয়, প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রেমস্পর্শ! মধুর সান্নিধ্য! সেবা -শুশ্রূষা, আদর-যত্ন ও হৃদয় নিংড়ানো উজার করা ভালোবাসা!
কিন্তু সেটা দেবে কে! শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম-ভালোবাসা তো মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছে জয়তীর! আবেগ-অনুভূতিগুলিও শুকিয়ে কবে কাঠ হয়ে গিয়েছে ওর! অথচ ওর ভালোবাসার মানুষটিই একদিন ও'কে বলেছিল, -'জয়া, শুধু তোমার মনটাই চাই না, ছুঁতেও চাই!' যেদিন সুদীপ্তর ঐ সরল আর লোভাতুর চাওয়াকে নৈতিক এবং সততা ভেবেই নিজেকে ধরা দিয়েছিল জয়তী। উজার করে ঢেলে দিয়েছিল ওর মন-প্রাণ, হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা। কিন্তু পেয়েছে কি ও'! শুধু দামী দামী শাড়ি আর গহনায় একজন বিবাহিতা স্ত্রীর মন কখনোই জয় করা যায় না! শত চেষ্টা করেও তাকে কখনো সুখী করা যায় না!
জীবনে এমন কি চেয়েছিল জয়তী? শ্বাশুড়ির মতো নিজের ঘর-সংসার উপেক্ষা করে কখনো তো নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চায় নি ও'! পারিবারিক সুখ-শান্তি নিজের পদতলে পিষ্ঠ করে বাইরের জগৎ নিয়ে কখনো তো থাকতে চায় নি ও'! ওতো চেয়েছিল শুধু, স্বামী আর সন্তান নিয়ে জীবনে সুখী হতে! সারাজীবন সুদীপ্তর হৃদয়ে ভালোবাসার ফুল হয়ে ফুটে থাকতে! সুদীপ্তর ঘরণী হতে! ওর প্রেয়সী হতে! সুদীপ্তর সন্তানের মা হয়ে জীবনকে ধন্য করতে! সার্থক করে তুলতে! সুদীপ্তর পরিচয়ে পরিচিতা হতে!
অথচ আজ সব কিছু হাতের মুঠোয় পেয়েও জয়তীর হৃদয়পটভূমির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, সুদীপ্তকে দেবার মতো এতটুকু আদর, মমতা, ভালোবাসা, প্রেম, মহব্বত!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডা প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।